ICBM
International Centre for Bengali Music
আন্তর্জাতিক বাংলা সঙ্গীত কেন্দ্র

পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সংগীত

রেবেকা আহ্‌মেদ
*এম.ফিল গবেষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সংগীত ইতিহাসে ও ইতিহাসের ঐতিহ্যবাহী সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে পুরান ঢাকার সংগীতগুলো। মূলত, পুরান ঢাকার প্রাচীনকাল হতে আজ অবধি এসব ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধশালী গানসমূহ তাদের সংস্কৃতিকে বয়ে নিয়ে চলেছে। এ গানগুলো ঢাকার আদি জনগোষ্ঠীর সাথে জড়িয়ে আছে যারা এই সংগীতবিষয়ক কলার বিশিষ্ট অনুরাগী ছিলেন। বাংলাদেশের সংগীত ইতিহাসে পুরান ঢাকার গানগুলো স্বকীয়রূপে প্রতীয়মান হয়ে আছে। যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা এই ঐতিহ্যবাহী সংগীত মুগল-পূর্ব সময় হতেই আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও ঢাকার বিগত চারশ বছরের সংগীতচর্চার ইতিহাস রচনায় তথ্যের অপ্রতুলতাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কারণে বিষয়টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, গান, গানের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে সুধীসমাজ ও গবেষকদের গোচরীভূত করা আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

ভূমিকা

রহস্য নগরী ঢাকা শহর, আর এর মাঝে পুরান ঢাকা হয়েছে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধশালী। দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ খুঁজে পেতে এই সমৃদ্ধশালী পুরান ঢাকার অধিবাসী তথা সাধারণ জনগণ মুগল আমল থেকে শুরু করে আজ অবধি বিনোদন খুঁজে পেয়েছে আপন লোকসংস্কৃতিতে। এই আপন লোকসংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে নানাভাবে। মূলত পুরান ঢাকার স্থানীয় অধিবাসীরাই এই লোকসংস্কৃতির উদ্ভাবক যার মাঝে ঐতিহ্যবাহী সংগীতের ধারা হচ্ছে একটি অন্যতম ক্ষেত্র।

পুরান ঢাকায় সংগীতের বিকাশ ঘটেছে নানাভাবে। পূর্বে নির্ধারিত সময়কাল হতেই দৈনন্দিন ও বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে একটি সংগীতের ধারা সৃষ্টি হয়েছে। যার মাঝে মূলত নওয়াব পরিবারের গজল, উর্দু, রেখতি, হিন্দীগীত, ঠুমরি, বাইজী গান, মুহর্‌রমের মর্সিয়া গীত, জন্মাষ্টমী সঙের গান, ক্বাসিদা, মিরাসান গান ইত্যাদি সংগীতগুলি নানা উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে উদ্ভব হয়েছে যার ফলে এই গানগুলি আজও পুরান ঢাকার একটি রস্‌ম কিংবা ধারা হিসাবে টিকে আছে। যেমন, এখানে একটি গানের কথা স্মরণ করা যায়, যে গানটি *হোসেন আফরোজ* নাটকের গান (বেহাগ রাগে রচিত, যা মুখে মুখে এখন প্রচলিত) :

বেতাব কাহ্‌ রাহি হ্যায়,
চালো কুয়ে ইয়ার মে
সীমাব কি তারাপ হায় দেলে (দিল) বেকারার মে

অর্থ: "হৃদয় বলছে চল প্রেয়সীর গলিতে, পারদের অস্থিরতা আমার ব্যাকুল অন্তঃকরণে বিদ্যমান।"

এই গবেষণাকর্মে মূলত পুরান ঢাকার সংগীতগুলির বিভিন্ন দিক ও ধরন এবং তাদের নানা রকম বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, পরিচয়, উদ্ভব, তাল, লয়, ভাষা ইত্যাদি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংগীত ইতিহাসে পুরান ঢাকার এসব ঐতিহ্যবাহী সংগীতগুলো একটি আলাদা স্বকীয়রূপে তার ধারা বজায় রেখে চলেছে। তবে যুগের পরিবর্তন আনয়নের ফলে এই সংগীতের ক্ষেত্রটি হুমকির সম্মুখীন। এমতাবস্থায় এটি সংরক্ষণ করা জরুরি। এই উদ্দেশ্যে গানগুলি পর্যবেক্ষণ করে সুবিন্যস্তভাবে আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপনের প্রয়াস চালান হয়েছে।

নওয়াব পরিবারের নাচ গান

নাচ ও গান সংস্কৃতির দুটি বড় উপাদান।[১] আর এই নাচ ও গান পুরান ঢাকার সমৃদ্ধশালী নওয়াব পরিবারের অত্যন্ত অপরিহার্য বিনোদনের বিষয় ছিল। নওয়াব পরিবারের নাচ ও গান সম্পর্কে জানা যায় বিভিন্ন গবেষক ও লেখকের বই, স্মৃতিকথা, জীবনী ও সংবাদপত্র হতে।

নওয়াব পরিবারের ভিত্তিস্থাপনকারী নওয়াব আবদুল গনি (১৮৩১-১৮৯৬) ও নওয়াব আহসানউল্লাহ-এর সময়ে নিয়মিতভাবেই আহসান মঞ্জিল দরবারে, শাহবাগে, দিলকুশাবাগে, উৎসব, জন্মদিন এমনকি খৎনা অনুষ্ঠানে নাচ ও গান হতো। নওয়াব পরিবারে যেসব শিল্পীরা নাচ-গান পরিবেশন করতেন, তাদেরকে এস্টেট হতে মাসিক ভাতা প্রদান করা হতো। এরা ভারতের লখনৌ, কানপুর, কলকাতা, বেনারস, পাটনাসহ অন্যান্য অঞ্চল হতে আসতেন।

নওয়াব পরিবারে বড় দরবারি নাচ ও গানের আসর ধারা বজায় ছিল ১৮৭০ থেকে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ নওয়াব আব্দুল গণির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। তবে নওয়াব সলিমুল্লাহর (১৯০১-১৯১৫) সময়কালের দরবারি নাচ ও গান হ্রাস পায়।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, হাকীম হাবিবুর রহমান তার '*ঢাকা পাঁচাস বারাস্ পাহলে*' গ্রন্থতে নওয়াব পরিবারের নাচ ও গান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, শাহবাগে প্রত্যেক চত্বরে শামিয়ানার নিচে তাওয়ায়েফদের আসর বসত। দর্শকেরা তাদের নাচ দেখত, গান শুনত।[২]

নওয়াব আহসানউল্লাহও তাঁর পিতার মতো নাচ ও গানের যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। জানা যায়, নওয়াব আহসানউল্লাহ ৪টি ফারসি গজল, ৩০টি উর্দু গজল, ৫টি উর্দু রেখতি ও ৮৫টি হিন্দীগীত রচনা করেছিলেন। এই গীতগুলো হোরি, বাহার, ভৈরবী, মালহার যুগিয়া, টৌড়ী, রামকেলি, মালকোষ, কাফি, ভীমকাল, বারোয়া, কানাড়া ইত্যাতি রাগে রচিত। নওয়াব আহসানউল্লাহ রচিত এসব গীত ও গজল পারিবারিক অনুষ্ঠানেও গাওয়া হতো। সেরকম একটি গান :

আজকে নবী
দুলহা বান গিয়া ... (॥)

নওয়াব আহসানউল্লাহ রচিত দুটি গজল :

ছুপায়ে কাব তাক, আব দিল মে ডালা হামরাজে উলফাত কো
কাহাতাক আবে দিদাসে বুঝায়ে নারে ফুরকাত কো ॥[৩]
দেলা খোশ হো কে ফাসলে গুল, গুলিস্তামে ফের আয়ি হ্যায়
নাওয়েদে আয়েশ ও ইসরাত ফের সাবা গুলশান মে লায়ি হ্যায় ॥[৪]

নওয়াব আহসানউল্লাহ ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যে আহসান মঞ্জিলে একবার ১৬ দিনব্যাপী নাচ ও গানের উৎসব আয়োজন করেছিলেন। তার দরবারে খেয়াল ও ঠুমরি গীত হতো। নওয়াব পরিবারের আরেক সংগীতবিশারদ ছিলেন খাজা আতিকুল্লাহ শাহজাদা 'শায়দা' (১৮৫৩-১৯২৮)। তিনি তার রচিত সংগীতগুলিতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর ব্যবহার করেছিলেন। যেমন, ঠুংরি, কাহারবা, খেয়াল, মল্লার, কাফি, মূলতান, পিলু, শাহানা, রামকেলি ইত্যাদি। এমনকি তিনি প্রচলিত রাগ ভেঙ্গে নতুন রাগ সৃষ্টি করেন। তিনি শতাধিক রাগ-রাগিণী বিশিষ্ট গীত রচনা করেছিলেন।

নওয়াব পরিবারের খাজা মুরাদ নওয়াব সলিমুল্লাহর নাতী, নাচ-গানের যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। খাজা মুরাদের পুত্র খাজা নঈমও একজন সংগীত রসিক ও সেই সাথে সংগীত শিল্পী। নওয়াব আহসানউল্লাহ রচিত অনেক গান ও সুর তার কাছে সংরক্ষিত আছে। আর এভাবেই বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে নওয়াব পরিবারে নাচ ও গান এখনো কিছু অংশ আজ অবধি টিকে আছে।

পুরোনো দিনের বাইজা গান

মুগল শাসক ইসলাম খানের দরবারে যে 'কাঞ্চনী' যাদের 'স্বর্ণময়ী নর্তকী' বলা হতো, মূলত তাদের উত্তরসূরিই হচ্ছে বাইজী। যারা পরবর্তীকালে পুরান ঢাকায় রাজা-উজির, নবাব-মহারাজা ও নওয়াব জমিদারদের বিনোদনের উপাদান হয়ে পড়েছিল। ঐতিহ্যবাহী পুরান দিনের ঢাকায় সেই সব বিখ্যাত বাইজীদের সুললিত ও সুমধুর কণ্ঠ ও মোহময়ী নৃত্যের দ্বারা মোহিত হতেন নওয়াব, জমিদাররা।[৫] তারা বিভিন্ন নওয়াব, জমিদার, ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন রকম আসর, দরবারে, জলসায়, বিয়ে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে নাচতেন, গান গাইতেন।

জানা যায়, কলকাতায় প্রথম বাইজী নাচ চালু হয়েছিল নগর পত্তনের সাথে। তখন কলকাতা ছিল রাজধানী এবং সেখানে বিভিন্ন নওয়াব, জমিদার, আমলা, নৃপতিরা বসবাস করত। তাদের বিনোদনের খোরাক হিসাবে বাইজীরা নাচ-গান করতেন। দিন দিন চাহিদার স্বরূপ বাইজীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ফলে গড়ে উঠে বাইজী পাড়া। আর কলকাতার স্বরূপ স্বয়ং পুরান ঢাকাতেও বাইজীদের নাচ-গান আরম্ভ হয়। তারা এখানে বসতি স্থাপন করে ধনী ও বিলাসীদের আভিজাত্যের ছায়ায়। অস্থানীয়দের পাশাপাশি স্থানীয় মেয়েরাও বাইজী পেশায় নিয়োজিত হয়।

উনিশ শতকে পুরান ঢাকায় নবাব নুসরাত জং, নওয়াব শামসুদ্দৌলা, এবং নওয়াব আবদুল গণি ও নওয়াব আহসানউল্লাহ্‌র সময়ে বাইজীদের নাচ-গান ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে। নওয়াব আবদুল গণির দরবারে যেসব বাইজীরা গান-নাচ করত, তাদেরকে নিয়মিত মাসোহারা দেওয়া হতো।

বাইজীরা এককভাবে গান ও নাচ করত, এদের গান ও নাচ সংযত রুচিসম্পন্ন এবং আভিজাত্যবোধের পরিচায়ক ছিল। বাইজী নাচে প্রধানত হাতের দোলা, মুখ, চোখ, নাচ ও ওষ্ঠের সূক্ষ্ম কম্পন দ্বারা নৃত্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে। বাইজীদের পোশাক ছিল পেশওয়াজ, চুড়িদার পাজামা, ওড়না, গায়ে চিকন ঘুঙুর।

সংগীতের পুরান পীঠস্থান হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকায় ছিলেন বেশ কিছু বাইজী যারা কলকাতার বাইজীদের থেকেও ছিলেন দক্ষ। কণ্ঠসংগীতের বিখ্যাত ওস্তাদ হোসেন মিয়া অনেক বাইজীদের তালিম দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ঢাকার বিখ্যাত বাইজীদের নিয়ে যাওয়া হতো। ঢাকার বিখ্যাত বাইজীদের মাঝে ছিলেন আমীরজান, অপল, গুন্নু, রাজলক্ষী, ইমামী প্রমুখ।[৬] এছাড়াও সমসাময়িক সুপনজান, মালকাজান বাই, গহরজান বাইজীরাও ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন।

বিখ্যাত বাইজী মালকাজান এর কণ্ঠে রেকর্ডকৃত সে সময়ের বিখ্যাত একটি গান হচ্ছে :

আমার এ সাধের তরী
প্রেমিক বিনা নিইনা কারে
যে প্রেম যানে না চড়তে মানা
ডোবে তরী একটু ভারে।[৭]

এছাড়া গহরজান বাইজীর কণ্ঠে গীত কয়েকটি বিখ্যাত গান : আজ কেন বঁধু, নিমেষের দেখা যদি, হরি বলে ডাকে রসনা।[৮]
হরিমতি বাইজীর কণ্ঠে গীত বিখ্যাত ঠুংরি, (ভৈরবী রাগ) :

রসিয়া তোরি আখিঁয়াওে,
জিয়া লালচায় ॥

উপরে উল্লিখিত বাইজীগণ ছাড়াও পুরান ঢাকার আরো অনেক বাইজী ছিল, যেমন : নওয়াব বাইজী, সরোজিনী, কুসুমা, সীতা, ষোড়শী, হরি, কোহিনূর, ভুবনেশ্বরী রানী, কনক, বিদ্যুৎ চারুবালা প্রমুখ। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নবাবী আমল পর্যন্ত বাইজী কেন্দ্রিক সংস্কৃতি ছিল পুরান ঢাকার সংগীতজগতে এবং এ ধার বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাইজীগণ পেশা হতে সরে যেতে থাকে। পুরান ঢাকার তৎকালীন সময়ে ঢাকাইয়া অত্যন্ত সংগীতরসিক হলেও তাদের মাঝে মুসলমান গায়ক ও বাদকরা অনেকেই ধার্মির্ক ছিলেন। বিশেষ শিয়া সম্প্রদায় এর মতাবলম্বী গায়কেরা টুপি ও ধার্মিক পোশাক ছাড়া গান-বাজনা পছন্দ করত না।[৯] তাই তাদের কারণেও এক সময় এককালের বিখ্যাত বাইজী গান বিলুপ্ত হয়ে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

মহররমের মর্সিয়া গীত

পুরান ঢাকায় মুহররমের মাসে 'মর্সিয়া গীত' এর খ্যাতি দীর্ঘদিনের। হিজরি সনের মুহররমের মাসে শোকবহ কারবালার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তবে এই কারবালার শোকাবহ ঘটনার স্মরণে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা মাতম করে শোক প্রকাশ করে। আর পুরান ঢাকায় এই শোক উৎসবের প্রধান কেন্দ্র হলো হোস্‌নী দালান ইমামবাড়া। মুহররমের মাসে শোক পালনের সময়েই মর্সিয়া গীত পরিবেশিত হয়। কারবালার সংগঠিত কাহিনী নিয়ে মর্সিয়া গীত রচিত, শিল্পীরা তাদের বুকে থাবা দিতে দিতে গান পরিবেশন করেন।

'মর্সিয়া' গীত গাওয়ার একটি কারণ 'লোকসমাজ সংগীতপ্রিয়', কি হিন্দু, কি মুসলিম এর ভেতর দিয়েই তাদের সাংস্কৃতিক পিপাসা নিবারণ করে। মুহররম উপলক্ষে মর্সিয়া যা ভাটিয়ালি জারিগান সাধারণ মানুষকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। এছাড়া ভাটিয়ালি সুরে জারিগান একেবারে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য।

হিজরি সনের মুহররমের মাসে শিয়া সম্প্রদায় প্রতিবছর শোকে মাতম করে মর্সিয়া পরিবেশন করে। সুন্নিসহ আরো অনেক সম্প্রদায়ের (মাজহাব) লোকেরাও সমভাবে অংশীদার হয়ে থাকে।[১০]

মর্সিয়া হলো এক ধরনের বিষাদমূলক কাহিনীভিত্তিক জারি, যেখানে ধর্মীয় সামাজিক আখ্যান দ্বারা এর গীত রচিত। আর মর্সিয়া গীতের বিষয় মূলত বিভক্ত করা হয়েছে ঘটনার বিশেষত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বিভিন্ন বিষয় এখানে উঠে এসেছে, যেমন: 'হাসানের বিষপান', 'জহরনামা', 'শহীদনামা', 'ইমাম হোসেনের জারি', 'উদ্ধার-পর্ব' ইত্যাদি।

পুরান ঢাকার মুহররম অনুষ্ঠান জাকজমকভাবে পালিত হয়ে থাকে। মহররম অনুষ্ঠানের একটি প্রধান উপাদান হলো 'মর্সিয়া' বা ভাটিয়ালি জারি গাওয়া। মূলত মুহররমের সকল দশটায় মর্সিয়া পাঠ করা হয়। এক সময় মুহররমের ১ তারিখ হতে ভাটিয়ালি সুরে বাংলাভাষায় ভাটিয়ালি মর্সিয়া পড়ার আসর জমত যা বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে পুরান ঢাকার শিয়া সম্প্রদায় মতাবলম্বীরা মর্সিয়া গীত গেয়ে মাতম করে শোকপ্রকাশ করে থাকে। পুরান ঢাকার মুহররম মাসে যে অনুষ্ঠান হয় তার বিবরণ: "মুহররমের চাঁদ দেখার রাত হতেই হোসনী দালান এর 'নহবৎ' বাজানো এবং তার সাথে সাথে মজলিসও শুরু হয়। প্রথম তিন রাত ধরে হোসনী দালানের প্রাচীর ঘিরে মোমবাতি জ্বালানো হয়। চতুর্থ দিন থেকে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। ভাটিয়ালি মর্সিয়া (ভাটিয়ালির সুরে শোকগাথা) শোনার জন্য হোসনী দালানের সারা বারান্দা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে।"

'মর্সিয়া' গীতের জন্য পুরান ঢাকার মোট বিশটি মহল্লাকে 'হাদি' ও 'গিরওয়া' নামে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক পক্ষ গান করে প্রশ্ন রাখে, অন্য পক্ষ আবার সেই প্রশ্নের উত্তর দেয় গানের মাধ্যমে।

'মর্সিয়া গায়কেরা দল বেঁধে আসে, প্রত্যেক দলের সামনে 'নিশান' থাকে, যাকে 'অরণি' বলা হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন বিভিন্ন মহল্লায় আতশবাজি পোড়ানো হয়। এখনকার 'মর্সিয়া'তে 'শিয়া' ও 'সুন্নি' দু'সম্প্রদায়ই যোগ দেয়।

মুহররমের পঞ্চম দিন 'ভিস্তিরা' রাস্তায় মিছিল বের করে। তারা মূলত 'সুন্নি', তাদের পোশাক বিশেষ ধরনের হয়। যেমন : সবুজ লুঙ্গি, সবুজ শার্ট, মাথায় পাগড়ি, গলায় কাফনি (কাফনের কাপড়) এবং কবজি ও গলায় সোনালি রঙের তাগা' বাঁধা থাকে। এক হাতে থাকে পানির গ্লাস, সঙ্গে পানির পাত্র, অন্য হাতে থাকে লাঠি আর পা খালি থাকে।

ষষ্ঠ দিনে ভিস্তিরা হোসনী দালানে গিয়ে তাদের লাঠিগুলি মাঠে কাঁচির মতো রেখে দেয়। আর লাঠির নিচে মোমবাতি জ্বালানো হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সব মহল্লার অধিবাসীদের মাঝে বিলানো হয় 'নিয়াজ'। সপ্তম দিন হলো 'জলুস' মিছিল। আর এদিন হোসনী দালান বিভিন্ন আলো দিয়ে সাজানো হয়। অষ্টম দিন অন্য মহল্লা হতে ভিস্তিরা আসেন মর্সিয়া গাওয়ার জন্য। 'অপরাহ্নে এ মর্সিয়া, গাওয়া হয় বলে একে বলা হয় 'দুপহরিয়া মাতম।'[১১] বিকালে হোসনী দালান হতে বিশাল মিছিল বের হয়। আর এই মিছিলের নাম হলো 'তুগ-গাস্ত' [তুর্কী শব্দ 'তুগ' মানে পতাকা, 'গাস্ত' মানে ঘুরে বেড়ানো], আর এই 'তুগ-গাস্ত' মিছিল পুরান ঢাকায় বকশীবাজার, উর্দুরোড, বেগম বাজার, দেওয়ান বাজার হয়ে চকবাজারে এসে পৌঁছায়। মাঝে মাঝে ভিস্তিরা শ্লোগান দিতে দিতে যায় :

এক নারা, দো নারা, বোলো বোলে ভেস্তা (॥)[১২]

নবম দিনে বিকেলে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঐদিন 'বিবি কা রওজা' থেকে মিছিল বের হয়। রাত এগারটার সময়ে চকবাজারে বিভিন্ন আখড়ার কলাকৌশল দেখার জন্য লোকজন ভিড় করে।

আশুরার দিন, অর্থাৎ দশম দিনে ইমামবাড়া থেকে তাজিয়ার মিছিল বের করে শিয়ারা। ঐদিনও তারা বুকে ও শরীরে বিভিন্ন অংশে ধারালো চাকতি, ব্লেড দ্বারা আঘাত করে এবং বুকে থাবা দিতে দিতে 'হায় হাসান', 'হায় হুসেন' বিলাপ বা মাতম করতে করতে সবাই আজিমপুরের কাছে হাসনাবাদে আসে। সেখানে তাজিয়াগুলি বিসর্জন দেওয়া হয়, কিন্তু অন্যান্য প্রতীক কবরগুলি কালো কাপড় দ্বারা ঢেকে হোসনী দালানে নিঃশব্দে নিয়ে আসা হয়। আর এভাবেই মুহররম অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হয়। উপরে উল্লিখিত মুহররমের উৎসব পালনের প্রথা মূলত ১৯৩০ সাল হতেই প্রচলন শুরু হয়। তবে পুরান ঢাকার বর্তমানে হোসনী দালান, পনেরটি মহল্লার ইমামবাড়ায় রসম্মত আজও মুহররম পালিত হয়। তবে কিছু আচার অনুষ্ঠানে ১৯৪৭এর শিয়া মহাজেরদের কারণে পরিবর্তনসাধিত হয়েছে। তবে মুহররমের দশ দিনের যে মূল অনুষ্ঠান হয় তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

জন্মাষ্টমীর সঙের গান

জন্মষ্টমী পালন পুরান ঢাকার একটি প্রাচীন উৎসব। বলা যায় ঢাকাবাসীদের অন্যতম উৎসবের মাঝে একটি হলো জন্মাষ্টমী।। প্রত্যেক বছর জন্মাষ্টমীতে মিছিল বের করা হয়। আর এই মিছিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সঙের মিছিল। এই সঙের মিছিলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গান পরিবেশন করা হয়। জন্মাষ্টমীর সঙের গান-এর কথা বিশেষ বিশেষ সময়ের রূপ বোঝা যায়। পুরান ঢাকার অধিবাসীরা সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে জন্মাষ্টমী মিছিলের জন্য। ঢাকাবাসীদের মাঝে হিন্দু-মুসলমান সবাই একত্রে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

উপমহাদেশে প্রায় সব অঞ্চলেই কোনো না কোনোভাবে তিথি উদযাপন হয়। অনুমান করা হয় যে, বিগত চারশ বছর যাবৎকাল ঢাকাবাসীগণ বিপুল আকারে অর্থ ও পরিশ্রম সহযোগে এই মিছিলের আয়োজন করে থাকে। এ সময় পুরান ঢাকার সমস্ত রাস্তাঘাট, বাড়িঘরের আশেপাশে লোকারণ্য হয়ে উঠে। সরকারীভাবে নিরাপত্তা সহকারে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল হয়। ঢাকার নবাবপুরের 'বসাক' সম্প্রদায় এক দিন এবং ইসলামপুর তাঁতিবাজারে হিন্দু বাসিন্দারা আরেকদিন মিছিল বের করে থাকে। কাজেই দুইদিন মিছিল হয়। এক বছর প্রথম দিন যে পক্ষের মিছিল বের করা হয়, পরের বছর পরদিন সে পক্ষের মিছিল বের করা হবে, এরকম নিয়ম থাকে।

মিছিলের প্রথমে স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত নানা রকমের 'আড়ানী' এবং বিচিত্র কারুকার্যময় মূল্যবান আলোকদণ্ড ও ছত্র ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। তারপরে কারুকার্যময় 'ঝুল' পরিহিত, মাথায় সুবর্ণ এবং রজতনির্মিত একটি মুকুটবিশিষ্ট কতগুলি হাতি ধীরমন্থর গতিতে বের হয়। নবাব-জমিদারকালে জন্মাষ্টমীতে ব্যবহৃত হাতিগুলি নেওয়া হতো নিকটবর্তী রাজা-জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে।

অতঃপর হাতির সাথে সাথে সুসজ্জিত 'পায়জামা' পরিহিত ঘোড়াও থাকে এবং পরবর্তী সময়ে সোনা রূপা ও পিতল দ্বারা নির্মিত অপূর্ব কারুকার্য বিশিষ্ট ছোট চৌকি, প্রদর্শিত হয়। ছোট চৌকিতে, সুসজ্জিত, 'রাজা' বসে থাকে। সবশেষে বড় চৌকি, যা নির্মিত হয় বাঁশকাগজ দিয়ে যা ২৫/৩০ হাত বিশিষ্ট লম্বা হয় এবং সংখ্যা ৪/৫টি চৌকি থাকে। বড় চৌকিতে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, ভৌগলিক এবং অন্যান্য বিষয়,

যেমনঃ অট্টালিকা, সভা, বন, উপবন, পর্বত ইত্যাদির বিচিত্র দৃশ্য থাকে। মিছিলে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। আর মিছিলের অনুষঙ্গ হিসাবে নৃত্য ও গান করা হয়ে থাকে।

পুরান ঢাকার নবাবপুর ও ইসলামপুর জন্মাষ্টমীর মিছিলগুলিতে সাধারণত বিভিন্ন বিষয়, যেমনঃ 'সাধ্য হরিনাম ও সাধন হরিণাম', 'অপ্সরার নৃত্য', 'শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ', 'শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যাগমন', 'অর্জুনের যাত্রা', 'পান্তর গৌরব', 'প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ', মনিপুরের রাসলীলা', 'পরীগণের নৃত্য', 'মেনকার আবির্ভাব', 'ভারতমাতার উল্লাস', 'সাগরবংশ উদ্ধার', 'যোগমায়া', 'শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা', প্রভৃতি ছাড়াও সমসাময়িক বিষয়সমূহ নিয়েও সঙের গান রচিত হয়। সঙের গানগুলিতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ও তাল ব্যবহৃত হয়। গায়কেরা যে সঙ গান গায় তার একটা অংশ জুড়ে থাকে কৃষ্ণ বন্দনা :

নেচে নেচে চল সখি রঙ্গে বৃন্দাবনে,

অখির ভুবনপতি উদিল নন্দভবনে।
অপরূপ রূপমাধুরি, নিরখি নয়ন-ভরি,
আয়লো সকল করি, হেরি হেরি এ জীবনে (॥)[১৩]

নবাবপুরের মিছিলের একটি অন্যতম সঙ গান হলো 'হরিণাম-সংকীর্তন'। এক সঙ শ্লোকটি হলো :

নামচিন্তামণি কৃষ্ণশ্চৈতন্যো রসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধোনিত্য মুক্তোহভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ (॥)[১৪]
অর্থ : 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম চিন্তামণি স্বরূপ, শ্রীচৈতন্যরসের মূর্তিস্বরূপ,
পূর্ণ, ও নিত্যমুক্ত, নামধারী অভিন্ন আত্মা।'

কয়েকটি জনপ্রিয় জন্মাষ্টমীর সঙ এর গানঃ [১৫]

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে অপ্সরা গণের নৃত্যঃ'
রাগিণী-ভৈরবী, তাল-ছ্পকীঃ
জয় নারায়ণ পতিত পাবন কনুষনাশন ভগবান,
মানসরঞ্জন ত্রিতা পভঞ্জন নিত্য নিরঞ্জন।
সাধ্য হরিনাম, সাধন-হরিনামঃ
রাগিণী ভাটিয়াল তাল্ ছপকীঃ
চৈতন্য রহবিগ্রং নাম; পরিপূর্ণ স্বরূপ শ্রীদাম- মধুর হরিনাম (॥)
শ্রী শ্রী রাধার পূর্বরাগ
রাগিণীঃ খাম্বাজ, তালঃ ছপ্কীঃ
সখি দেখলো কদম্ব তলে কি মাধুরী।
অপরূপ রসকূপ আমরি মরি (॥)

পুরান ঢাকায় জন্মষ্টমীর মিছিল প্রত্যেক বছর যে বিখ্যাত ও বিরাট আকারে ভক্তমণ্ডলী দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার! চারশত বৎসর যাবৎ ঢাকাবাসীগণ যে পরিমাণ অর্থ ও পরিশ্রম সহযোগে এই বিরাট মিছিলের আয়োজন করে থাকেন, তা স্বচক্ষে না দেখলে হৃদয়ঙ্গম হবার সম্ভাবনা নাই। মিছিলে এদের অসীম ধর্মানুরাগ, শিল্পনৈপুণ্য, সংগীতদক্ষতা, দর্শনপ্রিয়তা দেখে স্পর্শিত হয় অন্যান্য মানুষ। আনন্দ আর বিনোদন প্রদানের জন্য তারা রহস্যময় কথা ও গান মিছিলে পরিবেশন করে থাকে। জন্মাষ্টমীর সঙ-এর গান দর্শকের ও সংগীতের ভাবে পুলকিত হয় ও মোহিত ভবে জাগ্রত হয়। আর পুরান ঢাকার স্থানীয় অধিবাসী হিসাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যেক বছর এই জন্মাষ্টমীর মিছিল আয়োজন করে একটি আনন্দক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ছাদ-পিটানী গান

পুরান ঢাকার স্থানীয় অধিবাসীদের একটি অন্যতম সংগীতের ধারা হচ্ছে 'ছাদ-পিটানী গান'। ঢাকার ছাদ পেটানো গান এক ধরনের শ্রমসংগীত।[১৬] পুরান ঢাকার নির্মাণ শ্রমিক বা 'রাজমিস্ত্রিরা' কর্মে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ছাদ-পেটানোর সময় এক ধরনের লোকসংগীত গেয়ে থাকে, যা ছাদ-পিটানী গান হিসাবে পরিচিত। ছাদ-পিটানী গানের মাঝে একজন বাদক সর্দার এবং একটি শ্রমিকের দল থাকে যারা এই গান গেয়ে থাকে। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে ঢাকায় ছাদ-পিটানী গান বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

পুরান ঢাকায় পাকা দালানের ছাদ-ঢালাইয়ের কাজ হতো চুন-সুরকির মিশ্রণে। ছাদপোক্ত করার জন্য এবং ঢলাই মজবুত করার জন্য ভাল করে ছাদ-পেটানোর প্রয়োজন হয়। এবং এই কাজের জন্য এক শ্রেণীর শ্রমিক নিয়োজিত হয়, যারা 'ছাদ-পিটানী' নামে পরিচিত।

'ছাদ-পিটানীরা' ছাদ পেটানোর জন্য কাঠের এক বিশেষ ধরনের মুগুর ব্যবহার করে, যার বিভিন্ন নাম রয়েছে, যেমন : 'পিটনা', 'রেজা', অথবা 'কোবা'। 'কোবা' শব্দটির আরবি শব্দ হচ্ছে (মুগুর)।

ছাদ-পিটানোর কজে একদল শিশু শ্রমিক নিয়োজিত হয়। যাদের বয়স যথাক্রমে ১০ থেকে ১৭ এর মধ্যে থাকে। ছাদ-পিটানোর দলে এই কিশোরদের নিযুক্ত হতো দৈনিক মজুরের ভিত্তিতে এবং 'এদের নিয়োগকর্তা সর্দার নামে পরিচিত।'[১৭] এই সর্দারের হাতে থাকে একটি লম্বা বেত, আর কখনো থাকে অন্য হাতে একটি ছাতা, আর এই লম্বা বেত দিয়ে সর্দার ছাদ-পিটানী কিশোরদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। সর্দারের সঙ্গে থাকে একটি বেহালা-ওয়ালা গায়ক। তার গানই মূলত 'ছাদ-পিটানী, নামে পরিচিত।

'ছাদ-পিটানী গানের' রীতি হলো, প্রথমে বাদক সর্দার গানের এক পঙক্তি বা স্তবক গাইবে, এবং তখনই কিশোর দিন-মজুরেরা হাতের কোপা দিয়ে ছাদ-পেটাতে থাকবে। বাদক সর্দারের কণ্ঠস্বর থেমে গেলে কিশোর দিন-মজুরের দল ছাদ পিটানো বন্ধ করে সমস্বরে গানের পঙক্তি বা স্তবক একই সুরে পুনরাবৃত্তি করবে। আর এভাবেই চলতে থাকে ছাদ-পিটান এবং সমবেত সংগীত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব গানের বিষয় হয় প্রধানত আদি রসাত্মক বা ইঙ্গিতপূর্ণ।

আর হোতায় না সজনী
কালা কাউয়া কা কা করে
উাল দিয়া যায় রজনী (॥)

(তাই-হোতায়, কাউয়া, ফাল, তে, ভিরতে ইত্যাদি যথাক্রমে সমার্থবোধক সম্মানজনক শব্দ হচ্ছে শুইয়া থাকা, লাফ, কাক, তবে, ভিতরে ইত্যাদি।)[১৮]

ঢাকার খ্যাতিমান নাট্যকার ও এফডিসির রূপকার নাজির আহমেদ তৎকালীন ঢাকা শহর নিয়ে ১৯৫৩-৫৪ সালের দিকে 'সালামত' নামে একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। সে সময় ঢাকা শহরের জনপ্রিয় ছাদ-পিটানী গান এই চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়। আর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'সালামত' নির্মাণ করা হয়েছিল পুরান ঢাকার 'সালামত' নামে একজন ওস্তাগারকে নিয়ে। গানটি ছিল এরকম–

দে দে কানাইয়া লাল
বসন আসরে হাতে দে (॥)[১৯]

আরেকটি গান হচ্ছে–

ঢাকা থেকে
আইনা দিও
আবের চিরুনী (॥)[২০]

পুরান ঢাকার বিখ্যাত 'ছাদ-পিটানী' গান সুরে গাওয়া হয়। কিন্তু কথা ও সুর সর্বদা পরিবর্তন হয়ে থাকে। গানগুলি শ্রুতিমধুর হয়ে থাকে যা আজও শ্রমজীবী মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে।

কাওয়ালি

পুরান ঢাকার অধিবাসীদের সংগীতের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হলো 'কাওয়ালি গান'। কাওয়ালি গান মূলত পুরান ঢাকার বিভিন্ন জলসা, ওরস শরিফ, বিবাহ, গায়ে হলুদ ইত্যাদি। উৎসব ও অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়। খোদা-রসূল বা ওলিআল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গান গীত হয়। পুরান ঢাকায় একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা কাওয়ালি গীত পরিবেশন করে থাকে এবং 'কাওয়াল' নামে পরিচিত। 'কাওয়াল' কথাটি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সময় থেকে প্রচলিত।

কাওয়ালি এক প্রকার আধ্যাত্মিক প্রেম বিষয়ক ভক্তিমূলক গান।[২১] এ গান মূলত সফি-সাধকেরা গেয়ে থাকেন। ফার্সি ও উর্দুভাষায় রচিত কাওয়ালি গান মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

'কাওয়ালি' শব্দটি মূলত আরবি 'কওল' (কথ) শব্দ হতে এসেছে। সংগীতের সাথে অনুভূতির একটি গভীরতম সম্পর্ক রয়েছে। আর সংগীতে এই উপলব্ধি মানুষকে আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে ভাবতে শেখায়। আর সংগীতে অন্তর্গত 'সামার' বা ধর্মীয় সংগীত যার সঙ্গে আধ্যাত্মিকভাবে একটি চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে।

প্রাচীনকাল হতে সুফি-সাধকেরা এই 'সামার' (ধর্মীয় সংগীত) এর অনুরাগী ছিলেন। বিখ্যাত আউলিয়া 'গরিব নওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহ:) 'মারফতি সামা' (ইরান ধর্মীয় সংগীত)-কে আল্লাহতায়ালার নিগূঢ়তম রহস্য বা 'আসরারে এলাহি' মনে করতেন। আবার 'দিল্লীর নিজামউদ্দিন আউলিয়া তিনি নিজেই কাওয়ালির প্রতি অনুরাগী ছিলেন।[২২] আর তারাই প্রিয়শিষ্য ও বিখ্যাত সুফিসাধক আমির

খুসরু (রহ:) বহু রাগ-রাগনী, তবলা, ঢোল সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তিনিই এই 'কাউয়ালি' গানের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে একে প্রথাবদ্ধ রূপ সৃষ্টি করেন। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ আমীর খসরু 'কাওয়ালি' গানের প্রবর্তক হলেও তিনি এর পাশাপাশি 'খেয়াল' গানের স্রষ্টা।

কাওয়ালিতে অনেক সময় দুটি দল বিভক্ত থাকে, যারা এই গান একটি প্রতিযোগিতার উত্তর-প্রত্যুত্তর এর মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকে। এই গানে 'স্থায়ী ও অন্তরার মধ্যে তালবন্ধ রেখে প্রতিবার বিভিন্ন প্রকার ধরনের স্বরবিন্যাস বা রাগের সমাবেশ করা হয়'।[২৩] দলবদ্ধভাবে এই গান পরিবেশন করা হয়। এতে একজন মূল গায়ক থাকে, আর অন্যরা ধূয়া ধরে। তবলা, ঢোল, হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। গান গাওয়ার সময় সমবেতভাবে হাততালি দিয়ে তাল ঠিক রাখা হয়। আর এটি 'কাওয়ালি' গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সকল রাগ (আধ্যাত্মিক প্রেম প্রকাশক), সে সকল রাগেই কাওয়ালি গান পরিবেশিত হয়। তাল হিসাবে দাদরা, দুমালি, রূপক, পশতু ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। কাওয়ালিতে 'উর্দু শের বা কবিতার' ব্যবহার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পুরান ঢাকায় কাওয়ালি হচ্ছে একটি বিনোদনের মাধ্যম। উর্দু কাওয়ালি ছাড়াও কোনো কোনো পীর সাহেবের 'খানকাহ' শরিফে 'ফারসি' কাওয়ালি মজলিস হয়। পুরান ঢাকায় আবদল হাসনাত রোডের 'খাদেম-ই-শিলশিলা' জনাব শিবলী মোহাম্মদ ফজলুল করীম-এর বাড়িতে নিয়মিতই 'মজলিসে সামা' বা 'কাওয়ালি' অনুষ্ঠানের আসর বসে। জানা যায়, ভারতের রামপুর নিবাসী তিন বিখ্যাত কালু কাওয়াল, চান্দু কাওয়াল, মুরলী কাওয়াল এবং ১৯৬৫-১৯৬৯ পর্যন্ত আইয়ুব বেনারসী ও প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন রাজ তাদের দরবার শরিফে কাওয়ালির আসর জমাতেন।'[২৪]

জানা যায়, পাকিস্তানের দুই বিখ্যাত কাওয়াল শিল্পী গোলাম সাবেরী এবং মকবুল হোসেন সাবেরী কয়েকবারই পুরান ঢাকায় আমন্ত্রণে কাওয়ালি পরিবেশন করতেন। উল্লেখ্য, ঢাকায় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তারা শিবলী মোহাম্মদ ফজলুল করিম সাহেবের বাড়িতে কাওয়ালি পরিবেশন করেন এবং হোসনী দালানেও সুষমা মঞ্চে কাওয়ালি পরিবেশন করেন, তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তৎকালীন ওয়ার্ড কমিশনার 'গোলাম মোরশেদ'। তারা বিখ্যাত বিখ্যাত কাওয়ালি গান গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছেন। সেরকমই একটি বিখ্যাত গান হচ্ছে:

ভারদে ঝোলি
ইয়া পেয়ারা
মোহাম্মদ (॥)

সেকালে পুরান ঢাকার তৎকালীন কয়েকজন বিখ্যাত কাওয়ালি শিল্পী কায়েম রাজা, আমির রাজা, সালিম রাজা, মো. মোহাম্মদ ইউসুফ কাওয়াল, ইভু কাওয়াল, কালু কাওয়াল, ফতেহ্ মোহাম্মদ দারুন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

পুরান ঢাকার বর্তমানে সমীর, রাজা, এতেশাম, নুরু, কায়সার, এলাহী বকশ্ নূরে আলম, ছোট আইয়ুব, হায়দার হোসেন, শাহাবুদ্দীন নাদিম, হাসান শিহাব প্রমুখ কাওয়ালগণ জনপ্রিয় ধারায় কাওয়ালিচর্চা করে চলেছেন। 'রজ্জব' মাসে বিভিন্ন খানকাহ্ শরিফ, মাজাগুলোতে এবং বিভিন্ন মহল্লাগুলোতে ভক্তবৃন্দ কাওয়ালির অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। এছাড়া কাওয়ালি প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন গান যেমন :

১. 'মেরে আঙ্গনেমে মাঈনুদ্দীন আয়ারে' ॥
২. 'আয়োরে আয়ো খাজা ভাগ জাগায়ো' ॥

এরকম জনপ্রিয় দর্শক মাতকরা কাওয়ালি গান সারারাত পরিবেশন হয়ে থাকে। অনেক কাওয়ালকে টাকা ও টাকার মালাও উপহার দিয়ে থাকেন।

পুরান ঢাকায় কাওয়ালি গান সংস্কৃতির একটি আলাদা ধারা হলেও যুগের পরিবর্তনে এবং কালের প্রবাহে কাওয়ালি গানের চর্চা ঢাকা শহর থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। আধুনিক যুগের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে 'কাওয়ালি' আজ মজলিস ও বিভিন্ন উৎসব হতে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে।

ক্বাসিদা

'ক্বাসিদা' একটি আরবি শব্দ এর মূল আরবি শব্দ 'ক্বাসাদ' থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে 'ক্বাসিদা' বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর এই 'ক্বাসিদা' হচ্ছে পুরন ঢাকার একটি ধারা বা রস্‌ম, যা রমজান মাসে ভোর রাতে গাওয়া হয়।

'ক্বাসিদা' অর্থ প্রশংসামূলক কবিতা[২৫] বা বলা যায় যে, পারিভাষিকভাবে ক্বাসিদা হলো প্রিয়জনের প্রশংসা করা, যা কবিতার ছকে বর্ণনা করা হয়। আরবি কাব্যের সূত্র ধরে অন্যান্য ভাষায়ও এই শব্দটি ব্যপক প্রসারতা লাভ করেছে। আরবি, ফারসি, উর্দু, তুর্কি ভাষায় প্রচুর ক্বাসিদা লেখা হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগের সময় হতেই ক্বাসিদার বিরাট ভাণ্ডার গড়ে উঠে। আর তারই সূত্র ধওে মুগল, রাজকীয় দারবারেও ক্বাসিদা চর্চা শুরু হয়। ইসলাম খাঁ চিশতির সেনাপতি মির্জা নাথান মুগল অভিযানের বর্ণনামূলক গ্রন্থ '*বাহারস্থান-ই-গায়বি*'-তেও মুগল পৃষ্ঠপোষকতায় ক্বাসিদা চর্চার উল্লখ রয়েছে।[২৬]

পুরান ঢাকায় রমজান মাস শুরু হলেই সেহরির সময় রোজাদারদের ঘুম জাগানোর জন্য ক্বাসিদা গাওয়া হয়। আর তাই রোজাদারদের ঘুম ভাঙ্গে ক্বাসিদার ডাকে। 'রোজার মাসে ক্বাসিদা তাই রোজাদার ঢাকাবাসীদের কাছে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি প্রথম ডাক, পবিত্র মাসের পবিত্র আর একটি দিন শুরুর প্রথম আহ্বান।[২৭]

'ক্বাসিদা'-র বিষয়বস্তু মূলত, রোজার ফযিলতা, আল্লাহ্ রসুলের প্রশংসা, কেয়ামতের বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়।

মূলত উনিশ শতক হতেই পুরান ঢাকায় ক্বাসিদা গাওয়ার প্রচলন শুরু হয়। নবাবী আমলে ঢাকা শহরের প্রায় প্রত্যেকটি মহল্লাতেই সর্দাররা ক্বাসিদা দলের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

ঢাকায় নওয়াব আহ্সানুল্লাহর সময়ে ক্বাসিদা গাওয়ার ব্যাপক প্রসারতা লাভ করেছিল। কারণ নওয়াব আহ্সানুল্লাহ নিজেই ক্বাসিদা রচনা করতেন। 'তার রচিত উর্দু কাব্যগ্রন্থ *কুল্লিয়াতে শাহিন*-এ বেশ কিছু ক্বাসিদা স্থান পেয়েছে।[২৮] ঢাকা বর্তমানে উর্দু ভাষায় ক্বাসিদা গাওয়ার প্রচলন বেশি। তবে, মুগল আমলে 'ফারসি' ভাষাতে ঢাকার লোকেরা ক্বাসিদা গাইতেন। সেহরির সময় ক্বাসিদার মাধ্যমে রোজাদারদের জাগানোকে ঢাকাবাসী নেক ও পবিত্র কাজ মনে করে।

ঢাকায় বর্তমানে রোজার মাসে বিভিন্ন ব্যক্তির স্মরণে 'ক্বাসিদা' প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতা মূলত ক্বাসিদার উচ্চারণ, ব্যাকরণ, সুর, তাল, লয়, প্রভৃতি বিষয় বিচার করা হয়। ফলে বিভিন্ন আঙ্গিকে ও সংযোজনের ফলে উন্নতমানের 'কালাম' বা 'চরণ' রচিত হতে থাকে। কালামগুলি উর্দু ভাষায় রচিত হলেও এর মাঝে আরবি ও ফারসি ভাষার ব্যবহারও দেখা যায়। প্রতিযোগিতার জন্য লিখিত কালামর স্বত্ব সালারে কাফেলা সংরক্ষণ করে থাকেন। প্রতিটি ক্বাসিদার ছন্দবদ্ধ চরণের শেষবাক্যগুলির মধ্যে রচয়িতার নাম উল্লেখ থাকে।

ক্বাসিদাকে বিভিন্ন হিন্দি ছায়াছবির জনপ্রিয় গানের সুরের অনুকরণের পাশাপাশি কাওয়ালি, শাহেদি, মার্সিয়া, নাত-এর রাসূল, ভৈরবী, মালকোষ ইত্যাদি রাগেও সুর প্রয়োগ করা হয়। ক্বাসিদা কোরাস সহকারে গাওয়া হয়, যেখানে সাত থেকে আটজন তালিমপ্রাপ্ত গায়ক সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এদের মাঝে দলনেতাকে 'সালারে কাফেলা' বলা হয়। তিনি সংগীত রচনা, সুর প্রয়োগ ও উপস্থাপনার পাশাপাশি দল পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। পুরান ঢাকায় রমজান মাসে বিভিন্ন ধরনের ক্বাসিদার উল্লেখ পাওয়া যায় :

'চানরাতি আমাদ', যা রহমত, বরকত ও মাগফেরাত বার্তা নিয়ে আগমন ঘটে রমজানের চাঁদে।

১. **চাঁনরাতি আমাদ :** পবিত্র মাহে রমজানে চাঁদ নিয়ে আসা নতুন এক আমেজের ক্বাসিদা যা চাঁনরাতি আমাদ নামে পরিচিত।
২. **খুস আমদিদ :** উর্দু খুস আমদিদ-এর শাব্দিক অর্থ সু-স্বাগতম। রমজান মাসকে আনন্দের সাথে স্বাগত জানিয়ে প্রথম পনের রোজা পর্যন্ত খুস আমদিদ গাওয়া হয়। এই ক্বাসিদাকে অনেকে বলে 'সদা' আবার কেউ কেউ বলে 'খুস গাওয়ালি'।
৩. **আলবিদা :** রমজান মাসের বিদায়ের প্রাক্কালে, অর্থাৎ, ষোল রোজার পর থেকে আফসোস ও বিরহী সুরে আলবিদা গাওয়া হয়।
৪. **ঈদ মোবারক:** ঢাকায় ঈদের পরের দিন ঈদেও মিছিলে জাঁকজমক পূর্ণভাবে ঈদ মোবারক ক্বাসিদা গাওয়া হয়।
৫. **বিশেষ ক্বাসিদা :** রমজান মাসে সেহরির সময় রোজাদারদের ঘুম ভাঙানোর জন্য যে ক্বাসিদা গাওয়া হতো তা নির্দিষ্ট কোনো নিয়মনীতি অনুসরণে হতো না। এক্ষেত্রে দলীয় পরিবেশনা বা সুনির্দিষ্ট চরণও রচনা করা হতো না। বিশেষ এই ক্বাসিদা গায়কেরা ইবাদতের অংশ হিসাবে রোজাদারদের ঘুম ভাঙাতেন বলে জানা যায়। এই ক্বাসিদা গায়কেরা আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করতেন না এবং ক্বাসিদার সুর প্রায়ই ছায়াছবির জনপ্রিয় গানের অনুকরণে করা হতো।

পুরান ঢাকার ক্বাসিদা শুধুমাত্র ধর্মপ্রাণ রোজাদারদের আল্লাহভিত্তিক বা বিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল ঢাকার ধর্মীয় ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী নয়। বরং একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপমহাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ক্বাসিদার ভাষা, ভাষার সংমিশ্রণ, বিবর্তন, শিল্পী রচিয়তার দর্শন, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সংশ্লেষণ, প্রতিযোগিতাদের সামাজিক পরিচিত ইত্যাদির মাঝে লুকিয়ে আছে ঢাকার অতীত সমাজ ও সংস্কৃতির না বলা কথা।

কয়েকটি জনপ্রিয় ক্বাসিদা:

সময়কাল: **১৯৪৮**। রচিয়তা: এজাজ সুর: কাওয়ালি। কণ্ঠ: মো. জুম্মন মিয়া-

চাঁনরাতি আমাদ:
আ গায়া এ্যায় সামোয়া মাহে মোবারক আ গায়া
ছা গায়া সারি ফিজা পাব নূর বানকার ছা গায়া

সময়কাল: **১৯৪৮**। রচিয়তা: মুনসেফ সুর: হিন্দি ছায়াছবির গানের সুরের অনুকরণে কণ্ঠ: মো. জুম্মন মিয়া-

খুস আমদিদ:
খোসকে লাব পার আবরে রাহমাত খোদ নিসাওয়ার হো গায়া
মারাতাবে মাহে কারামসে দেকতেহি আজ হাম

সময়কাল: **১৯৪৮**। রচিয়তা: মুনসেফ, সুর: কাওয়ালি। কণ্ঠ: মো. জুম্মন মিয়া-

ঈদ মোবারক:
লুটলো এ্যায় সায়োমো মারাকানা ইল্লাল্লাহাকা
ঈদকি দিন হ্যায় পিও পায়মানা ইল্লাল্লাহাকা

সময়কাল: **১৯৫৫**। রচিয়তা: এজাজ, সুর: কাওয়ালি, কণ্ঠ: মো. জুম্মন মিয়া-

আলবিদা:
এ্যায় মাহে মোবারক মাহে কারাম
যানেকা আভি সামান নাহ্ কার
সময়কাল: ১৯৫০-৫৫। রচয়িতা: আনোয়ার হোসেন, সুর: হিন্দি দার্দ ছায়াছবির গানের সুরের অনুকরণে, কণ্ঠ: আনোয়ার হোসেন
বিশেষ ক্বাসিদা:
আল্লাহ্‌কা বান্দেকো হাম আয়ে জাগানেকা
হার দিলমে রামজানকি পায়গাম পাঁওচায়েঙ্গে।

পুরান ঢাকার কিস্‌সা বা লোক-কাহিনী

পুরান ঢাকার একটি এলাকা কেরানীগঞ্জের আটীস্থ বামনশুর গ্রামে 'কস্‌সা বা লোক-কাহিনীর প্রচলন আছে। কিস্‌সা মূলত কথা সহযোগে গানের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। এতে বিভিন্ন রূপকথার কাহিনী, সওদাগরের কাহিনী, পরীর কাহিনী ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে পুরান ঢাকার কিস্‌সাগুলি রচিত হয়। জানা যায়, কেরানীগঞ্জের আটীস্থ বামনশুর গ্রাম, আটীর পাচঁদানা, কেনারগাও গ্রাম, কলমারচর গ্রামে এখনও টিকে আছে পুরান ঢাকার এই ঐতিহ্যবাহী 'কিস্‌সা' বা 'লোক-কাহিনী'।

ঢাকার গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় এই কাহিনীগুলি সাধারণভাবে কিস্‌সা নামে পরিচিত। কিস্‌সা অর্থ গল্প, কাহিনী। 'কিস্‌সা' মূলত গীতিকা জাতীয় রচনা। 'সংযোগমূলক কথা সহযোগে, গানের মাধ্যমে এ সব কিস্‌সা কোন সুকণ্ঠ গায়েন লোক-লোকারণ্যে শুনিয়ে তাথে।'[২৯]

পুরান ঢাকার কিস্‌সাগুলি মূলত পূর্ববাংলার গীতিকা বা 'ballad'এর সমগোত্র হলেও মূলত এটি বর্ণনা প্রধান রচনা। ঢাকার লোককাহিনীর পর্যায়ে নিম্নোক্ত তিনটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে: 'চূড়ামণির কিস্‌সা', 'রাজকুমার সফরচান আর সবুজনিশো পরীর কিস্‌সা' 'পরীকন্যার কিস্‌সা'। নিম্নে পর্যায়ক্রমে কিস্‌সা তিনটি বর্ণিত হলো:

চূড়ামণির কিস্‌সা

দীর্ঘকালের এই কিস্‌সা সাতখণ্ডে বিভক্ত। একটি কেন্দ্রীয় কাহিনীর আধারে সাতটি কাহিনীর গ্রন্থনায় সমগ্র 'কিস্‌সা' সমাপ্ত। ঘটনাবিন্যাসের এই রীতি আরব্য রজনীর প্রভাবজাত। কিন্তু আরব্য রজনী বা বেতাল পঞ্চবিংশতির মতো কোনো রাজা-বাদশা এখানে কাহিনীর শ্রোতা নন। জনৈক জ্ঞান-পিপাসু তালবিলিমকে (শিষ্যকে) আশ্চর্য ঘটনার মাজেজা (তাৎপর্য) বর্ণনা প্রসঙ্গে তার গুরু এই সাতটি কাহিনী বলেছেন। শিষ্যের নাম চূড়ামণি এবং তার প্রশ্নোত্তরের কল্যাণে এই কাহিনী কথিত বলে এর সামগ্রিক নাম 'চূড়ামণি কিস্‌সা'।[৩০]

রাজকুমার সফরচান আর সবুজনিশা পরীর কিস্‌সা

এ কাহিনীতে পরীর রূপমুগ্ধ এক রাজপুত্রের নানা কষ্টবরণের মধ্য দিয়ে বাঞ্ছিতা পরীকন্যালাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রধানত রূপকথা ধর্মী। দৈতকুল নিধনের পদ্ধতিও রূপকথা অনুরূপ। শিয়রের ছোটপাথর ও পায়ের বড়পাথর অদলবদলে 'মৃত' কন্যার পুনর্জীবনলাভ রূপকথায় রাজকন্যার শিয়রে রূপারকাঠি ও পায়ে সোনারকাঠির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে চিন্তার বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। নানা বিশ্বাস-অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্যে 'চূড়ামণির কিস্‌সার' মতো এ কাহিনীতেও পাত্র-পাত্রীদের আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও বিপদমুক্তিতে আল্লাহর সক্রিয় সহায়তার কথা আছে। তবে চূড়ামণির কিস্‌সার মতো বাউল ভাবনা এ কাহিনীতে প্রশ্রয়হীন। বিপদে পড়ে রাজকুমার বলেছে:

জন্ম নিয়াছিলাম আমি বাসসা বাপের ঘরে।
এত দুঃখ লেইখাছিলা আমার কপালে রে
আমার আল্লারে ॥৩১

বিদায় দানকালে রাজকুমারের মা-বাপ একমাত্র পুত্রকে আল্লাহর হাতে তুলে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে তার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেছে এবং রাজকুমারের চরমবিপদকালে মাকে স্মরণ করে রাজকুমারের আকুল নিবেদনেই আল্লাহ্ অধিক বিচলিত হয়েছেন।

আমি বিনে আমার মায়ের আর তো কেহই নাই।
এমন মায়ের বুকে বুজি সেল মাইরা যাই ॥
আমার পোড়া কপাল রে ॥[৩২]

রাজকুমারের এই কাতরোক্তিতে আল্লাহ্ তার পথনির্দেশের জন্য ফেরেশতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাহিনীর মূলরস যদিও দেও-দৈত্যেও মুল্লুকে পরীরূপোন্মত্ত রাজকুমারের অভিযানে এবং উক্ত অভিযান ও আনুষাঙ্গিক ঘটনাবলি যদিও ইসলাম-সম্পর্ক রহিত, তবু রাজকুমার প্রভৃতির আল্লাহ্ নির্ভরতা তাৎপর্যপূর্ণ।

পরীকন্যার কিস্‌সা

এই কাহিনীতে ময়মনসিংহ গীতিকার অনুরূপ নির্যাতিতা নারী উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। চূড়ামণির দ্বিতীয় কিস্‌সার মতো এখানে এক ভণ্ডমুন্সি সওদাগর কন্যার রূপোন্মত্ত এবং তার প্ররোচনায় ধর্মান্ধ সওদাগর কন্যাস্নেহ ভুলেছে। ভ্রাতার অনুগ্রহে জীবনরক্ষা পেলেও কন্যাকে বনবাসে আত্মগোপন করতে হয় :

সাক্ষী থাইকো চন্দ্র তারা গো
সাক্ষী থাইকো গো তুমি,
আপনা ইজ্জত লাইয়া গো
বাহির হইলাম আমি ॥[৩৩]

বনবাসে ক্রমে বস্ত্র জীর্ণ হলো এবং শেষ পর্যন্ত এক বাদশার ছেলে তাকে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করে বিয়ে করে এবং তার দুই পুত্র হয়। কিন্তু এই সুখ ক্ষণস্থায়ী; কন্যা পিতৃগৃহে যেতে চাইলে উজিরের পরামর্শে ছেলেকে তার সঙ্গে দিতে বাদশা রাজি হলো না। উজির গেল তার সঙ্গে। এবং রাজ্যসীমা পার হয়েই উজির কন্যার রূপতৃষ্ণা হলো ও তার দুই পুত্রকে হত্যা করল। এরপর প্রচুর কৌশলে, কেবল আত্মশক্তিতে নির্ভর করে, কন্যা সকল বিপদজাল মুক্ত হলো। সকলের সুখের মিলনে এবং ভণ্ডমুন্সি ও উজিরের শাস্তিতে (কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুতে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া) কাহিনীর সমাপ্তি।

বনবাসে সওদাগর-কন্যার বস্ত্র জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, বাদশাজাদা যখন তাকে পাগড়ি খুলে দিয়ে উদ্ধার করে তখন সে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তাই বাদশাজাদার ধারণা হয়েছিল সে পরীকন্যা। পরীকন্যার দেশে গেলে বাদশাজাদা আর ফিরবে না– উজিরের এই যুক্তিতে বাদশা পুত্রকে শ্বশুরবাড়ি যেতে দেয়নি এবং পরে বিফলকাম উজির বাদশাকে এসে বলেছে পরীকন্যা উড়ে গেছে। এই সব কারণে সওদাগর-কন্যার এই কাহিনীর নাম 'পরীকন্যার কিস্‌সা'।

উপরে বর্ণিত তিনটি কিস্‌সা হচ্ছে পুরান ঢাকার লোকসংস্কৃতির একটি ঐতিহ্যবাহী ধারা যা আজও ক্ষীণ ধারায় কিছু কিছু জায়গায় টিকে আছে।

মিরাসী বা মিরাসান গান

ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সম্মেলন এই পুরান ঢাকা। পুরান ঢাকায় আছে মিরাসী বা মিরাসান গান যার প্রচলন আদিকাল থেকে। সময় ভেদে মানতে গেলে ১৮৭২ সাল থেকে। তখন এর প্রচলন সীমাবদ্ধ ছিল কিছু হিন্দু সম্প্রদায় এবং কিছু কিছু অন্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যে। তখনকার যুগে এই গান ছিল মাত্র একটি আনন্দঘন এক সন্ধ্যা যা পরবর্তীকালে এক রসম বা ধারা হিসাবে খ্যাতিলাভ করে।

হিন্দুধর্মাবলম্বীরা এই ('সন্ধা') সংগীতকে প্রচলন করেছিলেন যা এখন প্রচলিত আছে। কিছু কিছু উচ্চ মুসলিম ও নবাব পরিবার এর মধ্যে ছিল যা সময়ের তালে তালে সমগ্র পুরান ঢাকা এবং ভারতের কিছু মুসলমান পরিবার এর প্রসার ঘটায়। পুরান ঢাকায় এই রস্‌ম বা ধারা অতি আনন্দ বা হাসিঠাট্টার মাধ্যেমে পালন হতো।

এই মিরাসান গানের ধন ছিল: বর-কনের উভয় পরিবারের বিভিন্ন সদস্য এবং সদস্যের নামের মাধ্যমে গান গাওয়া হতো যার ফলে এই গান সাফল্য পায়। এই গানের নির্দিষ্ট কোনো গায়ক কিংবা গায়িকা ছিল না। এলাকার বিভিন্ন সুরচীরাও এই গান গাইত। এই গানের ধরন ছিল দুই পক্ষ হয়ে গাওয়া যা অবিকল কাওয়ালি প্রতিযোগিতার মতো।

পুরান ঢাকায় 'মিরাসীরা' ঢাক-ঢোল নিয়ে অন্দরমহলে গান পরিবেশন করতে এবং বংশানুক্রমে এই পেশায় নিয়োজিত হতো। 'মিরাসী' হলো 'ফারসি' শব্দ যার অর্থ, বংশানুক্রম বা উত্তরাধিকার সূত্র। মিরাসীরা সাধারণত বিয়ে উপলক্ষে অথবা 'নাক ছেদানী' 'কান ছেদানী' সুন্নতে খৎনা অনুষ্ঠানে গান-বাজনা করত। এদের গান-বাজনার মূলত মেয়ে মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরা সাধারণত দরিদ্র বিধবা, কখনো নাচে না, তবে মাঝে মাঝে সংসারে জীবনযাপনে এরা বেশ মর্যাদাবান।[৩৪] বিনোদনের প্রয়োজনে 'মিরাসীরা' পুরুষের বেশিও গান করত বা বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করত। তাদের গানের অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

পুরান ঢাকায় বিয়ে উপলক্ষে কয়েকদিন ধরে সারাদিনই লাউড স্পিকারে গান চলতে থাকে। আর এই লাউড স্পিকারের প্রচলন হওয়ার আগে বিয়ে বাড়িতে অতিথিদের বিনোদনের জন্য সংগীতের বিকল্প ব্যবস্থা চালু ছিল, 'মিরাসী'রাই ঢোল ও করতাল বাজিয়ে গান-বাজনা করত। এরা নিজেরা উর্দুতে কথা বলত বা হিন্দি বা উর্দুভাষায় গান গাইত। মাঝে মাঝে এর গানের সাথে নাচও পরিবেশন করত।

"ফারসি শব্দ 'মেরাসী' হলো পুরুষ গায়কের দল, আর মহিলা গায়কের দল হলো 'মিরাসীন্'।[৩৫]

জানা যায় যে, পুরান ঢাকায় পেশাদার নর্তকী সম্প্রদায়কেও সে সময় 'মিরাসীন্' বলা হতো। এক সময় পুরান ঢাকায় 'মিরাসী' গান খুব জনপ্রিয় ছিল।

আতুর ঘরে মহিলারা চল্লিশ দিন কাটানোর পর পরিবারের আনন্দ উৎসব হতো। বিয়েতে গান-বাজনা হতো, গায়ে হলুদে সারারাত ব্যাপী এর আসর জমে উঠতো:

আল্লাহ্ মোহামদকা দোয়া,
শুগরিলায়া ইয়ার বানা,
শুগারিলায়া ইয়ার বানা,
নাওসানি লায়া ইয়ারবানা (॥)[৩৬]

প্রথমে তারা আল্লাহ্ রসূলের নামে দুটি গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করত। এরপরে অন্যান্য কাজ শুরু হতো। জনপ্রিয় দুটি গানের পঙ্‌ক্তি :

রাত ভারও রাইও,
সবেরা চালা যাইয়োজি
চান্দিকা ঢোলা,
চামাক রাহা হ্যায় (॥)[৩৭]
আলুয়া চাউলকা ভাত পাকাকে
খরি মসুর কা ডাল (॥)[৩৮]

এসব গান সাধারণত অন্দরমহলে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হতো। পূর্ববাংলায় একমাত্র পুরান ঢাকাতেই মিরাসীনদের প্রাচীন ঘরানা ছিলো বলে জানা যায়। কিন্তু, এককালে 'মিরাসী' বা 'মিরাসীন'দের প্রচলন থাকলেও এদের জায়গা দখলা করে নিয়েছে হিজড়ারা। হিজড়ারা বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষে মেয়ে মহল বা পুরুষ সমাবেশে নির্বিশেষে নাচ-গান করে থাকে।

হোলি বা ঝুলন উৎসবের গান

পুরান ঢাকায় উনিশ শতক হতেই হোলি উৎসব যথেষ্ট আনন্দ ও আয়োজন সহকারে পালিত হতো। ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রধানত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঝুলন উৎসব আয়োজন করে থাকে। পুরান ঢাকার বৈষ্ণবরা এই উৎসবটি বড় আকারে উদ্‌যাপন করে থাকে। প্রতীকী শ্রীকৃষ্ণ নির্মাণ করে এই উৎসবের দোল দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। এটি প্রায় দোলযাত্রা বা হোলি অনুরূপ এবং রাধাকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব হিসাবে পরিচিত।[৩৯]
পুরান ঢাকায় হোলি হলো এমন একটি উৎসব যেখানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমবেতভাবে যোগদান করে সমান উৎসাহে। প্রতিবছর দোলযাত্রায় রচিত হয় হোলির গান, উর্দুভাষায়। এক বছর ভিখন ঠাকুর-এর বাজারে হোলির আসর বসলে, পরের বছর তা বসে উর্দু বাজারে লালাবাবু বাড়ির সামনের ময়দানে। আসরটি হয় অনেকটা কবিগানের মতো। হোলিতে আসর জমে উঠে, আর এই আসরের মহড়া হোলির দু'দিন আগে শুরু হয়। উর্দু ও বাংলার সংমিশ্রণে আসর জমে উঠে।

হোলি ছাড়া আড়ম্বরের সাথে ও সমান উৎসাহে পালিত হয় 'ঝুলন'। ঝুলনের সময় শহরের ঠাকুরবাড়িগুলিতে তিনদিনব্যাপী চলতে থাকে নাচ, গান, যাত্রা, কীর্তন ও সেতারের আসর। এছাড়া পুরান ঢাকায় এগুলোর পাশাপাশি খেমটা-নাচও পরিবেশন করা হয়। ঝুলন যাত্রা দেখা যায় বাবু কালচারের ছাপ।[৪০]

পুরান ঢাকায় একটি সম্মিলিত তেহার বা উৎসব হলো 'হোলি'। প্রাচীনকালে বিশেষ করে নায়েব নাজিমের আমলে 'হোলি'র আসর জমত এবং সেখানে অত্যন্ত শৃঙ্খলাভাবে হোলি খেলা হতো। ঢাকাবাসীরা পূর্ণ জোশে 'হোলি' উৎসব প্রতেক মহল্লায় বেশ জোরেশোরে শুরু করে থাকে। হোলির অনুষঙ্গ হিসাবে আবীর খেলা হয়।

'হোলি' উৎসবে পুরান ঢাকায় আগে ময়দানে অনেক বড় শামিয়ানা টাঙানো হতো। সেখানে দু'দলই কমপক্ষে দু'ঘণ্টা গাইতে পারে যাকে ঢাকাইয়া ভাষায় রং বলা হয়, হোলিতে ঝাঁঝ ও খোলের সহযোগে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি দলই হিন্দুস্থানী ভাষায় গান রচনা করে থাকে। হোলির গান রচনাকারী কবিগণ বেশির ভাগ হিন্দু আর অল্পসংখ্যক মুসলমান।[৪১]

ঝুলন উৎসবকে কেন্দ্র করে পুরান ঢাকার হিন্দু এলাকায় ঘরে ঘরে শোভা পায় রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি। শাঁখারি ও বসাকেরা হচ্ছে পুরান ঢাকার আদি বাসিন্দা, তারা মূলত বৈষ্ণব মতানুসারী। ঝুলন উৎসবের সময় শাখারি বাজারে বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত খোল ও করতালের শব্দে মুখর হয়ে থাকে।

প্রত্যেক বছরই হোলির জন্য নতুন গান রচনা হতো এবং প্রত্যেক দল তার নিজের প্রতিযোগীকে ছন্দের তালে তালে মন খুলে ভর্ৎসনা জানায়।

ঢাকায় হোলি সত্যিকার অর্থে কবিগানের লড়াই। হোলি বলতে শুধু রং খেলাকেই বুঝায় না মূলত সমবেত সংগীতকে বোঝায়। আর এই দলগত /সমবেত সংগীত প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র ঢাকার জন্য প্রযোজ্য। সমবেত কণ্ঠে গান গাওয়া ঢাকা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। ঢাকায় এক সময় বড়ো ধরনের উৎসব হয়ে উঠেছিল হোলি বা ঝুলন উৎসব। সম্ভাবত ঢাকায় বৈষ্ণবদের সংখ্যা হ্রাস এবং অনুকূল পরিবেশ বিনষ্ট হলে ঢাকার ঝুলন উৎসবে ভাটা পড়ে।

উপসংহার

বিগত চারশ বছরের ইতিহাসে পুরান ঢাকার গানগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এ সংগীতগুলোর সূচনা মূলত প্রাক-মুগল সময় হতেই এবং পরবর্তী মুগল, নবাবী, কোম্পানি ও নওয়াব সময়কাল হতেই সংগীতগুলো ধারাবাহিকভাবে কিংবা কখনো অতিবাহিত প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আর এখনকার জনগোষ্ঠীর পুরোটাই হলো বিনোদন প্রেমিক, আর যার কারণেই তাদের দৈনন্দিন জীবনে সংগীত একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

পুরান ঢাকার সংগীতের বিকাশ ঘটেছে নানাভাবে আর ওইসব সংগীতের বিকাশ ঘটেছে নানারকম উৎসব ও উপলক্ষেকে কেন্দ্র করে। এখানে একটি গানের উদাহরণ দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায়ঃ

'বাবুল মোরা নৈহার ছুটিহ জায়'
অঙ্গনা তো পর্বত ভায়ো
অউর দেহরী ভায়ে বিদেশ,
লে বাবুল শিয়া কি দেশ
সঙ্গ চলহী জায় (॥)

(রাগ- ভৈরবী, বিলম্বিত লয়) অঙ্গ-ঠুমরী)

অর্থ: আমার প্রাণের দুলালী পিত্রালয় ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই প্রাঙ্গণ পাহাড় সম, এই দেহ পরদেশের ন্যায় বোধ হচ্ছে।

পুরান ঢাকার গানগুলো তার ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে পুরো জাতির কাছে তুলে ধরছে যা বাংলাদেশের সংগীত ইতিহাসে একটি আলাদা ক্ষেত্র হিসাবে আসন বিস্তার করেছে।

পুরান ঢাকা নিয়ে কমবেশি গবেষণা পূর্বেও হয়েছে। সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং গুরুত্ব তুলে ধরে অনেক বিস্তারিত গবেষণাই পাওয়া গিয়েছে যা বর্তমান লেখকের গবেষণা কর্মে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোতে পুরান ঢাকার এসব সংগীতগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বা সুবিন্যস্ত আকারে আলোচিত হয়নি। এই সংগীতগুলো বর্তমানে যদি সুবিন্যস্ত আকারে সংরক্ষণ না করা হয় তবে তা কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। বাঙালি জাতি হিসাবে আমাদের সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে সংরক্ষণ করা উচিত।

এই গবেষণা সংগীতবিষয়ক হলেও এখানে প্রাচীনকালের পুরান ঢাকার ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা প্রত্যেকটি অধ্যায়ে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে। এই গবেষণার সার্থকতা যেমন পূর্ববর্তী গবেষকদের গভীর অনুসন্ধান ও অনুপ্রেরণার ফসল। তেমনই গবেষণাটি বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্রের দিক উন্মোচিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. অনুপম হায়াৎ, *পুরানো ঢাকার সাংস্কৃত প্রসঙ্গ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৭৯
২. হাকিম হাবিবুর রহমান, *ঢাকা পাঁচাস বারাস পাহলে* (অনুবাদঃ হাশেম সূফী), ঢাকা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১২১
৩. রফিকুল ইসলাম রফিক, *ঢাকা শহরে উর্দু সংস্কৃতি,* পৃ. ৭৪
৪. রফিকুল ইসলাম রফিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
৫. অনুপম হায়াত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
৬. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র,* (১ম খণ্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬৩
৭. অনুপম হায়াৎ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬
৮. অনুপম হায়া/, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬
৯. M. Mufakharul Islam and Firoz Mahmud, '400 Years of Capital Dhaka and Beyond', *Economy and Culture,* (Vol. 2), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2010, p. 337
১০. সাইম রানা, *পরিবেশনা ও শিল্পকলা,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাটিট, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭১
১১. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র,* (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭
১২. মুনতাসীর মামুন, *পুরান ঢাকার উৎসব ও ঘরবাড়ি,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ. ১৮
১৩. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র* (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬
১৪. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র* (৪র্থ খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩
১৫. পূর্বোক্ত
১৬. শরীফউদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা কোষ,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০৫
১৭. মো. আব্দুল কাইউম, *পুরান ঢাকার ইতিবৃত্ত* (ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি), ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭২
১৮. বঙ্গেশ্বর রায়, *ঢাকা আমার ঢাকা,* কালান্তর প্রেস, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৯
১৯. মো. আব্দুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
২০. পূর্বোক্ত
২১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২১৯
২২. রফিকুল ইসলাম রফিক, *ঢাকায় বিনোদন,* ঢাকা, পৃ. ৩১
২৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত
২৪. রফিকুল ইসলাম রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২
২৫. শরীফউদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১
২৬. শরীফউদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত

২৭. শায়লা পারভীন, *ঢাকার হারিয়া যাওয়া ক্বাসিদা*, 'বাংলাদেশ চর্চা', ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১১
২৮. শরীফউদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত
২৯. মো. মনিরুজ্জামান, *ঢাকার লোককাহিনী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩
৩০. মো. মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত
৩১. মো. মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত
৩২. মো. মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত
৩৩. মো. মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত
৩৪. মো. আব্দুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
৩৫. শরীফউদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত
৩৬. প্রাগুক্ত
৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. প্রাগুক্ত
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
৪০. মুনতাসির মামুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
৪১. হাকীম হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫